মুক্তমন ও মুক্তমনা - ৪

প্রদীপ দেব

বিজ্ঞানের নামে প্রতারণা

১৮ এপ্রিল, ২০০৫। আমি আমার বোহেমিয়ান ট্যুরের মাঝামাঝি পর্যায়ে হিউস্টন থেকে নিউ অরলিন্স শহরে এসে পৌঁছেছি। হোটেলে বিশ্রাম নিতে গিয়ে টিভি অন করার কিছুক্ষণ পরেই খবরটি পেলাম। ভ্যাটিকানের পোপ নির্বাচনের সরাসরি সম্প্রচারের মাঝখানে প্রচারিত হলো খবরটিঃ শিকাগো শহরের কাছে মোটরওয়ের একটি ব্রিজের নিচে নিরাপত্তা দেয়ালে ভেসে উঠেছে ভার্জিন মেরির মুখ। এ জাতীয় উন্মাদীয় খবর নতুন নয়। মাঝে মধ্যেই শোনা যায় হিন্দুদের দেবতা গনেশ দুধ খেতে শুরু করেছেন, পেঁপের ভেতরে পাওয়া গেছে কোরান শরিফের আয়াত, বুদ্ধমূর্তির চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু ইত্যাদি। আর ভার্জিন মেরির অলৌকিক ঘটনার প্রচার তো একটা নিয়মিত ব্যাপার।

২০০৩ এর ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রামের একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চে ভার্জিন মেরির চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে বলে প্রচারিত হয়। কয়েক হাজার উৎসুক মানুষের ভিড়ও লেগে যায় মূর্তির চোখ থেকে অশ্রু গড়ানো দেখতে। তখন অনেকে বলেছেন যে বাংলাদেশে ক্রমাগত সন্ত্রাস আর অরাজকতা সইতে না পারার কষ্টে কাঁদছেন মেরি। ইটালিতে এরকম মূর্তির চোখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তেও নাকি দেখেছেন অনেকে। কাচের বেষ্টনির ভেতর রাখা মার্বেল পাথরের মূর্তির গায়ে জলীয় বাষ্প জমতেই পারে এবং তা একসময় গা বেয়ে গড়িয়ে পড়তেও পারে। তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণেই তা হয়। আর্দ্রতার কারণে ঘরের দেয়াল থেকেও মাঝে মাঝে এরকম হয়। আবার অনেকে ইচ্ছে করেই প্রতারণা করেন এসব নিয়ে। ভারতের বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরে গনেশের দুধ খাওয়ার ঘটনাও নিছক ধর্ম বিশ্বাসীদের নিয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রতারণা। তবে রটনা যেভাবে প্রচার পায়, আসল ঘটনা উদ্ঘাটিত হলে তা সেভাবে প্রচার করেনা প্রচার মাধ্যমগুলো।

বিশ্বের বেশির ভাগ প্রচার মাধ্যমই হলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। সেখানে লাভ লোকসানের হিসেবটাই মুখ্য। সে হিসেবে খবরের দ্রব্যমূল্য প্রাধান্য পায়। এই তো সেদিন ২০০৪ এর নভেম্বরে এক পিস পাউরুটি বিক্রি হয়েছে ২৮ হাজার ডলারে। ওই পাউরুটির টুকরোয় নাকি ভার্জিন মেরির মুখ ভেসে উঠেছে! ভার্জিন মেরিকে নিয়ে অলৌকিকত্ব প্রচারের নিত্যনতুন কৌশল আবিষ্কৃত হয়েই চলেছে। সুতরাং ভ্যাটিকানে মৃত পোপ জন পলের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের দিনেই ভার্জিন মেরির আবির্ভাব ঘটানোটা যে ধর্মবিলাসী জ্ঞানপাপীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমেরিকার এই গরীব রাজ্যের সংখ্যাগুরু নিগ্রোদের মাঝে ভার্জিন মেরির আবর্ভাবের খবর কেমন প্রভাব ফেলে তা দেখার একটা কৌতূহল কাজ করছিলো মনে।

এই পাউরুটির টুকরোটি বিক্রি হয়েছে ২৮,০০০ ডলারে।

সারাদিন ঘুরলাম মিসিসিপি নদীর তীরে, ফ্রেন্স কোয়াটার সহ নিউ অরলিন্সের অলিতে গলিতে। শহরের বাসিন্দারা বেশির ভাগই আফ্রিকান আমেরিকান, এবং তারা বেশ গরীব। এখানে এখনো প্রেতচর্চা হয়, আফ্রিকান ভুডু সহ আরো অনেক অন্ধ কুসংস্কারে বিশ্বাস এদের। মিউজিয়ামের পাশেই চার্চ। চার্চের দরজায় ঝকঝকে তামার ফলকে লেখা আছে, এখানে পোপ জন পল এসেছিলেন একবার। ভার্জিন মেরি সম্পর্কে কোন প্রচার না দেখে বুঝতে পারলাম মেরির আবির্ভাবের খবরটি তখনো এসে পৌঁছায়নি চার্চের হাতে।

ফেরিতে চড়ে মিসিসিপির ওপারে যাবার সময় ফেরির যাত্রীদের কথোপকথন থেকে বুঝতে পারলাম ভার্জিন মেরির হাওয়া আসতে শুরু করেছে। ঘন্টা দুয়েক পরে এপারে এসে দেখতে পেলাম চার্চের সামনে ভীড় জমে গেছে। ভার্জিন মেরির মাহাত্ম্য প্রচার শুরু হয়ে গেছে। চার্চ বাসভাড়া করে শিকাগো ট্যুরের ব্যবস্থা করে ফেলেছে - আর ধর্মবিশ্বাসী কালো মানুষেরা লাইন ধরেছে শিকাগো যাবার জন্য। গরীব মানুষের অলৌকিক ধর্মে বিশ্বাস বেশি। তারা ১০০ টাকা উপার্জন করলে ১০ টাকা চাঁদা দেন উপাসনালয়ে। অর্থাৎ আয়ের প্রায় শতকরা দশভাগ তারা অলৌকিকত্বে দান করেন। নিউ অরলিন্স থেকে শিকাগো যাবার বাসভাড়ার টাকাটাও অনেকে ধার করে জোগাড় করেছে এখানে, পরে শোধ করার জন্য হয় ছিনতাই করবে, নয়তো ড্রাগ বেচবে। ধর্ম আর নৈতিকতার এরকমই মিশ্রণ সবখানে।

রাতে টিভির সবগুলো চ্যানেলেই প্রচারিত হলো ভার্জিন মেরির খবর। টিভিতে দেখা গেলো হাইওয়ের একটি কংক্রিট ব্রিজের নিচে দেয়ালের ছিদ্র বেয়ে ময়লা পানি পড়তে পড়তে দেয়ালে বেশ বড় দাগ পড়ে গেছে। সেখানে কল্পনা করে দেখতে চাইলে যে কোন মুখই কল্পনা করা যায়। এর মধ্যেই দেয়ালের কাছে মোমবাতি জ্বলতে শুরু করেছে, জমে যাচ্ছে মানুষের ভিড়। বেশির ভাগ টিভি চ্যানেলই মনে হচ্ছে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস উস্কে দিচ্ছে।

পরের দিন বেরিয়ে পড়লাম মায়ামির উদ্দেশ্যে। পথেই কাটলো প্রায় ছত্রিশ ঘন্টা। বিকেলের দিকে মায়ামি বিচে গিয়ে এক জায়গায় দেখলাম ভার্জিন মেরির উদ্দেশ্যে ফুলদেয়া আর মোমবাতি জ্বালানোর হিড়িক। শিকাগোর ব্রিজের নিচে যা দেখা গেছে আমার দৃষ্টিতে তা ময়লা পানির দাগ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের ঠুলিপরা চোখে হাতিও দেখা যায় না। আমেরিকা মুক্তবাক্যের দেশ বলে শুনে এসেছি। আমার যা বলার আছে তা আমি বলতে পারবো নির্দ্বিধায়, এরকম একটা ব্যাপার বলা হয়ে থাকে - যার পোশাকী নাম বাক্‌স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতার সুযোগ নিতে চেষ্টা করলাম। মেরি মাতার জয়গানে মুখর একজন সুটকোটপরা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, ভার্জিন মেরি তো শুনেছি শিকাগোর ব্রিজের নিচে আশ্রয় নিয়েছেন, তা আপনারা এখানে ফুল দিচ্ছেন কেন? জবাবে ভদ্রলোক যা বললেন তাতে আমার এতদিনের অর্জিত পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান গুলিয়ে গেলো।

- এখানে কেন দিচ্ছি? ব্যাপারটি বুঝতে হলে তোমাকে বুঝতে হবে এনার্জি আর ম্যাটার আর এন্টাই-মেটার (এন্টির আমেরিকান উচ্চারণ - এন্টাই)। ফিজিক্স - বুঝলে কিনা সব ফিজিক্স। ভার্জিন মেরির এনার্জি পৃথিবীর সবখানে ছড়িয়ে আছে ইকুইলিব্রিয়াম ভাবে, সাইমিট্রিক্যালি।

আমার মনে হলো ভদ্রলোক যে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন তা না বুঝেই করছেন, বা জেনে শুনেই সবাইকে ধন্ধে ফেলার চেষ্টা করছেন। প্রশ্ন করলাম,

- শুধু পৃথিবীতে কেন, পৃথিবীর বাইরে নেই?

তিনি আমার রসিকতার ধার দিয়েও গেলেন না। সিরিয়াস হয়ে উত্তর দিলেন,

- পৃথিবী বলতে আমি অনেক ব্যাপক অর্থে বোঝাচ্ছি।

এই আরেক বিপদ এদের নিয়ে। এদের কথার কোন সামঞ্জস্য থাকেনা। ক্ষণে ক্ষণে এদের যুক্তি পালটে যায়, শব্দের অর্থ পালটে যায়। তরলকে এরা এখন কঠিন বললো তো একটু পরেই হয়তো বলবে বাষ্প। চেপে ধরলে বলবে তাপমাত্রার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাপদিলে তো কঠিন তরল বাষ্প হতেই পারে। ধর্ম বিশ্বাসীদের সাথে যুক্তির তর্ক করতে গেলে

দেখা যায় তাদের সবকিছুই সাবজেক্টিভ, অবজেক্টিভিটির ধার তারা ধারেন না। একই জিনিসের তারা অনেক রকম অর্থ করেন।

ধর্ম আর বিজ্ঞান নিয়ে বিতর্ক অনেকটা নেশার মত। শুরুতে যতই নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চাই, একবার শুরু হয়ে গেলে তখন আর কিছু খেয়াল থাকে না। মায়ামি বিচের পুরো বিকেলটাই মাটি হয়ে গেলো আমার। ভদ্রলোকের নাম জন আব্রাহাম। মায়ামির একটি পাবলিক স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক। ব্যক্তিগতধর্মে যারা অন্ধ - তাদের হাতে বিজ্ঞানের সব ফ্যাক্ট অক্ষত থাকে না। শুধু বাংলাদেশে নয় - আমেরিকাতেও তা হচ্ছে। এই জন আব্রাহাম ফিজিক্স পড়ানোর ফাঁকে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে অলৌকিকত্ববাদও প্রচার করেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরো বিপদের কথা হলো - জন আব্রাহাম বিশ্বাস করেন যে বাইবেল হলো সকল বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। আমার চারপাশে জন আব্রাহামের মতই পাঁচ ছ জন লোক, চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে তাদের। খুব ভয় পাচ্ছিলাম আমি। মায়ামি বিচ এমনিতেই বিপজ্জনক এলাকা। ভার্জিন মেরিকে অপমান করেছি ভেবে এরা যদি আমাকে খুনও করে ফেলে কিছু করার নেই। রণে ভঙ্গ দিলাম। জন আব্রাহাম কিছু লিফলেট ধরিয়ে দিলেন হাতে - খ্রিস্টান দ্বীনের দাওয়াত!!

শিকাগোর মটর ওয়ের ব্রিজের নিচে ভার্জিনে মেরির মুখ!

হোটেলে ফিরে টিভিতে দেখলাম শিকাগোর ভার্জিন মেরি ইতোমধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে বসে গেছেন ব্রিজের নিচে। ফুল আর মোমবাতির পাহাড় জমে গেছে। ব্রিজের ময়লা দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে ভার্জিন মেরি আর যীশুখ্রিস্টের রঙিন ছবি। যে ময়লা পানির ছাপ দেখে এত আয়োজন সে আসল জিনিসটি এখন অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে ভক্তিরসের জোয়ার আর ফুল মোমবাতির স্তুপে। মোটর ওয়ের গাড়ি চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে, কিন্তু বাধা দেয়া যাচ্ছে না। ধর্মের নামে কেউ কিছু করলে তাতে বাধা দেয়ার সময় সবাই কেমন যেন দুর্বল হয়ে যান। তাই দেখা যায় অন্যের জমি বা সরকারী জমি দখল করার সহজ উপায় হলো দখল করার পরে একটি মসজিদ বা মন্দির তৈরি করে ফেলা। এখানেও সেরকম অবস্থা। যে মোটর ওয়ের পাশ দিয়ে পায়ে হাঁটারও নিয়ম নেই - সেখানে এখন শত শত মানুষ, টিভি ক্যামেরার ছড়াছড়ি। টিভি ক্যামেরার সামনে চোখ কপালে তুলে কেউ কেউ বলছেন, "জীবনে প্রথমবারের মত বুঝতে পারছি - বুকের ভেতর একধরনের শিহরণ হচ্ছে আমার। বাতাসে ভাসছে ভার্জিন মেরির শক্তির আভাস। আমি তা বুঝতে পারছি।"

জন আব্রাহামের প্রচারপত্রে দাবী করা হচ্ছে বাইবেল হলো সব প্রশ্নের সমাধান, সকল শক্তির উৎস। দেখলাম, এরা এখন ধর্ম প্রচারের নতুন কৌশল নিয়েছেন। বিজ্ঞানের সাথে কিছুতেই পেরে উঠছে না দেখে এখন ধর্মকে বিজ্ঞানের সাথে মেলানোর জগাখিঁচুড়ি চেষ্টা চলছে। আধুনিক সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমরা যেভাবে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করি - সেরকম এখন শুরু হয়েছে ধর্মকে বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ করার চেষ্টা। কিন্তু যা বিজ্ঞান নয় - তাকে বিজ্ঞান সম্মত করতে হলে অনেক কিছুই বদলে ফেলতে হয়। অনেক বছর আগে লেখা ধর্মের বইগুলোর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সংস্করণ বের করতে পারলে সুবিধা হতো, কিন্তু তা করা নাকি ধর্মেই নিষেধ আছে। পুরনো ধর্মের কেতাবকে এখন আধুনিক বিজ্ঞানের আদলে চালাতে গিয়ে ভীষণ এলোমেলো হয়ে গেছে সব। টুপিকে টেনেটুনে ছাতা বলে চালাতে গেলে অসুবিধে

তো হবেই। জন আব্রাহামদেরও এখন সেরকম অবস্থা। তাঁদের সংগঠনের ওয়েব সাইটের ঠিকানা দেয়া আছে www.doesgodexist.org।

ঈশ্বর আছেন কি? - এরকম একটি প্রশ্নবোধক নাম রেখে সংগঠনটি সন্দেহবাদীদেরও দলে টানতে চাচ্ছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জন ক্লেটন (John N. Clayton) পেশায় জিওলজির শিক্ষক। পড়েছেন গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, সায়কোমেট্রি। নটরডেম ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেছেন জিওলজি ও আর্থ সায়েনসে। বিজ্ঞান পড়লেই বা বিজ্ঞানে ডিগ্রি নিলেই যে মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠবে সেরকম কোন নিয়ম নেই। বিজ্ঞান মনস্কতার চর্চা না করলে বিজ্ঞান মনস্ক হওয়া যায় না। মনকে মুক্ত না করে সত্যিকারের বিজ্ঞান মনস্ক হওয়াও যায় না। জন ক্লেটন নিজেকে দাবী করছেন বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে। বলছেন প্রথম যৌবনে তিনি নাস্তিক ছিলেন - যা ছিলো তাঁর ভুল-জীবন। নাস্তিকতাকে তুলোধুনো করার উদ্দেশ্যে Why I Left Atheism - শিরোনামে বিশাল এক প্রবন্ধও লিখেছেন (www.doesgodexist.org/AboutClayton/PastLife.html) ।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বিজ্ঞানের মূল সুরটিই তিনি ধরতে পারেন নি এখনো। বিজ্ঞান সবসময় ফ্যাক্টকে গ্রহণ করে - এবং বিজ্ঞান সব সময়েই আধুনিক। একশ বছর আগের বিজ্ঞান আর আজকের বিজ্ঞানে একশ বছরেরই পার্থক্য। আজ যদি আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র নিউটনের মেকানিক্স নিয়ে থাকতে চাই - তাহলে থাকতে আমি পারবো - কিন্তু আমার থাকা হবে বড় সীমাবদ্ধ রকমের। একটা সীমাবদ্ধ ধারণার বাইরে আমি যেতেই পারবো না। ধর্ম বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও সেরকম একটা ব্যাপার ঘটে। তাঁদের বিশ্বাস একটা নির্দিষ্ট গন্ডিতে আবদ্ধ। তাঁদের ক্ষেত্রে মনের ভেতর একটা নির্দিষ্ট ফলাফল আগে থেকেই প্রোথিত থাকে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু তা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান আজ যা বলছে তা আজ পর্যন্ত জানা উপাত্ত ও তথ্যের ভিত্তিতেই বলছে। কাল যদি তা ভুল প্রমাণিত হয়, বিজ্ঞান আজকের ভুল আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকবে না। ইথারের অস্তিত্ব এখন ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মাত্র একশ বছর আগেও বিজ্ঞানে এর অস্তিত্ব ছিলো।

সৃষ্টিকর্তা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন- ভক্তিবাদীদের এ তত্ত্বের বিপরীতে যুক্তিবাদীরা যে প্রশ্ন করেন তা হলো - সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তা কে? প্রবীর ঘোষ তাঁর অলৌকিক নয় লৌকিক বইতে পরিষ্কার ভাবে এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসীদের যুক্তি এ প্রশ্নের ব্যাপারে বড়ই সীমাবদ্ধ। জন ক্লেটন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তা প্রশ্নের উত্তর হিসেবে একটি প্রবন্ধ তৈরি করেছেন "Who Created God" শিরোনামে (www.doesgodexist.org/Phamplets/WhoCreatedGod/WhoCreatedGod.html)। প্রবন্ধের শুরুতে কসমোলজিক্যাল স্ট্যান্ডপয়েন্ট থেকে শক্তির উৎস ও থার্মোডায়নামিক্সের এনট্রপি সংক্রান্ত সামান্য আলোচনা করে জন ক্লেটন বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি বৈজ্ঞানিক আচরণ করছেন। কার্ল সাগানের বিখ্যাত বই Cosmos এর ২৫৭ পৃষ্ঠা থেকে একটি উদ্ধৃতিও দিয়েছেন, "If we say that God has always been, why not save a step and conclude that the universe has always been?" কিন্তু একটু পরেই দেখা গেলো বিজ্ঞানবক্তা ও বিজ্ঞানের শিক্ষক বলে দাবীকৃত জন ক্লেটনের শেষ দৌড় ঐ বাইবেল পর্যন্তই।

তিনি লিখছেন, ঈশ্বরকে মানুষের মত কল্পনা করলে চলবে না। ঈশ্বরের ধারণা অন্যরকম। তারপর উদ্ধৃতি দিয়েছেন বাইবেল থেকে - যা তাঁরা সব সময়েই দিয়ে থাকেন, অসংলগ্ন সব উদ্ধৃতি - "God is a Spirit….", "God is not a man, that He should….". আর দরকার আছে এসবের? সেই পুরনো সব এলোমেলো কথার মালা। আরে বাপু, ঈশ্বর যদি একটি ধারণাই হয় - তাহলে তো বেশ। ধারণা বদলায়, পালটায়, মেজে ঘঁষে আধুনিক হয়। তার তো মুখাবয়ব থাকার কথা নয়। তাহলে ব্রিজের নিচে মানুষের মুখ দেখা যায় কেন? ভার্জিন মেরি - তাহলে মানুষ। খুব ভালো। কিন্তু মানুষ মানুষের মত আচরণ করেন না কেন? যীশুকে জন্ম দেয়ার পরেও ভার্জিন থাকেন কেমন করে তিনি? জন ক্লেটনের প্রবন্ধটি পড়ার পর নিজেকে প্রতারিত মনে হলো। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের শুরুতে দুতিন লাইনের অ্যাবস্ট্রাক্ট পড়েই বোঝা যায় প্রবন্ধটি পড়ার দরকার আছে কিনা। তাতে সময়ও বাঁচে, মেজাজও ঠিক থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রসঙ্গে নতুন কিছু জানবো আশা করে প্রবন্ধটি পড়ার পরে নতুন কিছুতো পেলামই না, বরং আবারো প্রমাণ পেলাম যে বিজ্ঞান পড়ে যখন কেউ বিজ্ঞান নিয়ে ভন্ডামি করেন তখন ভীষণভাবেই করেন।

ভার্জিন মেরি প্রসঙ্গে বিশ্বাস আর বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবসান হবে না। কারণ এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিন্তু বিশ্বাসীরা এখন প্রমাণ করতে চাইছেন যে ওটাও বিজ্ঞান সম্মত। বিজ্ঞান সম্মত না হলে যে আর গ্রহণযোগ্যতা থাকছে না, তারা তা

বুঝতে পেরেছেন। এখন তাদের বৈজ্ঞানিক-সার্টিফিকেট দরকার হয়ে পড়েছে এবং এখানেই তাদের বিশ্বাসের পরাজয় ঘটেছে।

বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে ধর্মবিশ্বাস ফেরি করে বেড়াচ্ছেন এরকম আরো একজনের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে আমার। সেই ডক্টর হিউ রস (Hugh Ross) সম্পর্কে আগামীতে। সবাইকে বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

১৪ এপ্রিল, ২০০৬
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া